লাঙল না খুঁড়লে মাটি।
মই না দিলে পরিপাটি।
ফসল হয় না কান্নাকাটি।

চাষের কথা

থেকে বলদ না বয় হাল।
তার দুঃখ সর্বকাল।

বর্ষ ১৬ ।। সংখ্যা ৫ ।। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৩ ।। ১৫ ভাদ্র -১৩ কার্তিক ১৪২০

লোকসভা নির্বাচন

কৃষির অবস্থা ও কৃষকের দাবি

ভারতের কৃষি

বিবিধ কৃষি - আবহাওয়া অঞ্চলের কারণে ভারতের কৃষি বৈচিত্রময়। তা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর ৯-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই প্রতিটি রাজ্যের কৃষি ও চাষি নিদারুণ সঙ্কটের মুখোমুখি। এই সঙ্কটের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ফসল উৎপাদনের খরচ বাড়ছে অথচ লাভ হওয়া দূরস্থান, উৎপাদন খরচ পূরণ হওয়ার মতো দাম চাষি পাচ্ছে না। কিছুক্ষেত্রে লাভ বলে যা প্রতিভাত হচ্ছে, তা তার কায়িক শ্রমের মজুরি। কৃষিক্ষেত্র ক্রমেই অলাভজনক হয়ে উঠছে। অন্যদিকে, চাষি পরিবারের দিন-প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তাদের কেনার ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে আকাশছোঁয়া দামের কারণে। এসবেরই ফলশ্রুতি ঋণের জালে জড়িয়ে যাওয়া। ফলে ১৯৯৫-২০১১ মধ্যে ২৯০,৪৭০ জন চাষি আত্মহত্যা করেছে (রাজ্য সভায় কৃষি প্রতিমন্ত্রি হরিশ রাওয়াতের লিখিত বক্তব্য - ৩১ অগস্ট ২০১২)।

এসবই ফল। কৃষি সঙ্কটের আসল কারণ লুকিয়ে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের 'উদারবাদী' অর্থ ও কৃষিনীতিতে। কৃষি থেকে ক্রমশ হাত গুটিয়ে নিচ্ছে সরকার। এর উদাহরণ কৃষি উৎপাদনের উপকরণ থেকে ভরতুকি হ্রাস, বীজের ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানির উপর নির্ভরশীলতা। পাশাপাশি দেশের বাজারে প্রচুর ভরতুকিতে তৈরি বিদেশি কৃষিপণ্য ঢোকানোর পথ সুগম করা। এতে দেশের কৃষিজীবিরা এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। স্বল্প সুদে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের কোনো ব্যবস্থা তো করাই হচ্ছে না। উল্টে ব্যাঙ্ক বা সমবায় থেকে যেটুকু ঋণের যেটুকু সুযোগ ছিল তাও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। চাষি বাধ্য হচ্ছে অধিক সুদের মহাজনী ঋণের ওপর নির্ভরশীল হতে। কৃষি পণ্যের সহায়ক মূল্যের যে ব্যবস্থা ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছিল সরকার সেই ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ সরে আসছে। ফলে দেশি বিদেশি বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে দেশের কৃষিক্ষেত্র। মনসান্টো-সিনজেন্টা, আর্চার-মিডল্যান্ড-ড্যানিয়েল, ওয়ালমার্ট-এর মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, উৎপাদন খরিদ ও তার প্রক্রিয়াকরণ এবং তা বাজারজাত করার বিশাল চিত্রনাট্য লেখা হয়ে গিয়েছিল বিশ্বায়িত ব্যবস্থায়। বর্তমানে তা মঞ্চস্থ করছে ইন্দো-ইউএস নলেজ ইনিটিয়েটিভ অন এগ্রিকালচার। এই চিত্রনাট্যে চাষির ক্রীড়নক হওয়া ছাড়া কোনো ভূমিকা নেই। সরকার যে

ছবি : ইন্টারনেট

কৃষিক্ষেত্রকে অবহেলা করছে তা বোঝা যাবে বছর বছর দেশের গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষির ক্ষয়িষ্ণু অবদান দেখে। ভারতের গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ৯০-৯১-এ, যখন উদারবাদী অর্থনীতি শুরু হয়, কৃষির অবদান ছিল ২৯.৮৯ শতাংশ। ২০০০-০১ সালে যা কমে দাঁড়িয়েছিল ২২.২৬ শতাংশে। এখন, ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে এই হার দাঁড়িয়েছে ১৩.৭ শতাংশে।

ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে-এর ৬৮তম সমীক্ষার তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৫২ শতাংশ এখনো হচ্ছে কৃষি থেকে। কিন্তু ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১ সালের জনগণনা রিপোর্ট তুলনা করলে দেখা যাবে এই সময়ের মধ্যে, প্রায় ১কোটি ৫০ লক্ষ লোক কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়েছে। এদের বেশিরভাগই পরিণত হয়েছে সাধারণ মজুরে। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ২০০০ জন চাষি চাষ ছেড়ে দিচ্ছে। উদারবাদী ব্যবস্থার ঘোষিত লক্ষ্যই হল, কৃষির শিল্পায়ন এবং একাজে লোকসংখ্যা কমানো। কিন্তু অন্য কোন ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে এই 'অদক্ষ' কর্মীরা যাবে ? দ্বিতীয়ত এটা স্বীকৃত যে, এই ব্যবস্থা সৃষ্টি করছে কর্মসংস্থানহীন উন্নতির। আর বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়নের হার তো ১৯৯১ এর সময়কার হারে চলে গেছে।

দেশের সংবিধান অনুযায়ী কৃষি রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। তবে বেশ কিছু বুনিয়াদী সিদ্ধান্ত (যেমন সবুজ বিপ্লবের প্রবর্তন, বীজ আইন ১৯৬৬ প্রণয়ন) করত কেন্দ্রীয় সরকার। এতে সবসময় যে ফল ভালো হয়েছে তা নয়। তবে দেশের কৃষি নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গ্যাট চুক্তি তার পরবর্তীতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অঙ্গুলি হেলনে, উদার অর্থনীতি যুগে, ক্রমশ কৃষি থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। পেটেন্ট, বীজ, জল, জৈব প্রযুক্তি, চাষে বিদেশি বিনিয়োগ সহ

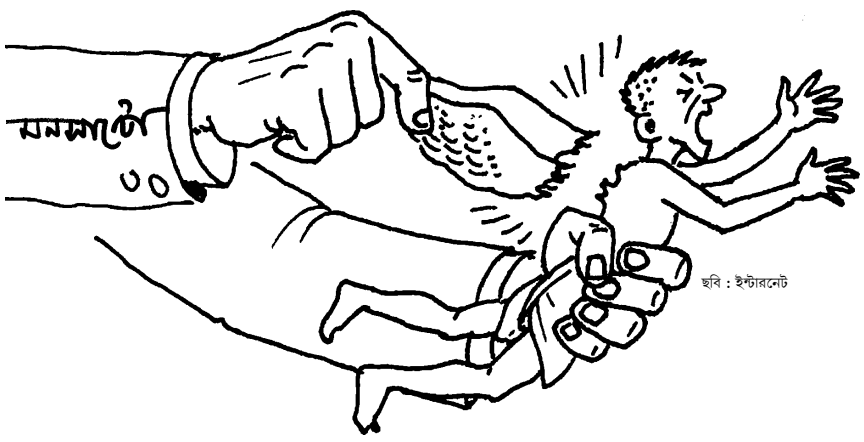

ছবি : ইন্টারনেট

সম্পাদকীয়

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন। আগামী মে মাসের মধ্যেই তৈরি হবে নতুন সরকার। সেই সরকার কোন পথে চলবে। কী হবে তার অর্থনীতি, শিল্পনীতি, কৃষিনীতি। তা নিয়ে সমাজের সর্ব স্তরের মানুষেরই নানা মতমত রয়েছে। কিন্তু অর্থ ক্ষমতায় যারা বলবান তাদের কথাই শোনা যাচ্ছে। তারাই তাদের বশংবদ সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে দেশ কীভাবে চলবে তার পাঠ পড়াচ্ছেন সাধারণ মানুষকে। কিন্তু চাষি কী চায়, মজুর কী চায়, খেটে খাওয়া আম আদমি কী চায় তা জানার কী কোনো প্রয়াস আছে রাজনৈতিক দলগুলি। উত্তর না। কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষদের নিজেদের তাগিদ রয়েছে তাদের নিজেদের অবস্থা তাদের ভালোমন্দ সোচ্চারে তুলে ধরার। যেহেতু এই পত্রিকা কৃষি বিষয়ক সেই কারণে এখানে দেশের বা রাজ্যের কৃষির অবস্থা এবং কৃষকেরা কী চায় তা তুলে ধরা হল।

সম্পাদক

সেপ্টেম্বর -অক্টোবর ২০১৩

আরো অন্যান্য আইন ও নীতির মাধ্যমে কৃষির বুনিয়াদী বিষয়গুলি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে বহুজাতিকের হাতে। অথচ রাষ্ট্রসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার সংস্থা তাদের প্রকাশিত দ্য স্টেট অব ফুড ইনসিকিউরিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট ২০১৩'র 'কি মেসেজ' বা মুখ্যবার্তায় বলছে, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বর্ধিত খাদ্য সংস্থানের নীতি বিশেষ করে ছোট জোতের চাষিদের লক্ষ্যে রেখে যদি তৈরি করা যায়, তবে বিশ্ব থেকে ক্ষুধা দূর করা সম্ভব। এমনকি যেখানে ব্যাপক দারিদ্র রয়েছে সেখানেও সম্ভব। এরসাথে যদি সামাজিক সুরক্ষা ও আয়ের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তাদের খাবার কেনার ক্ষমতা বাড়ানো যায়, তবে তা চনমনে গ্রামীণ বাজার এবং আরো বেশি কাজের সুযোগ তৈরি করবে। যা আবার ন্যায়সঙ্গত আর্থিক উন্নতি ও গ্রামোন্নয়নে সহযোগী হবে।

আমাদের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে ধারাবাহিক মতামত ও মূল্যায়ন দরকার যাতে এর আরো উন্নতি করা যায়। এর জন্য একটি স্বাধীন মূল্যায়ন সংস্থা গঠন করা জরুরি। ইন্ডিয়া রুরাল ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১২-১৩ প্রকাশের সময় একথা বলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ। রিপোর্টটি তৈরি করেছে আইডিএফসি ফাউন্ডেশন সহ আরো কিছু নামজাদা গবেষণা ও সামাজিক সংস্থা মিলে। ইন্ডিয়া রুরাল ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট প্রকাশ অনুষ্ঠানে যোজনা কমিশনের সদস্য ড. মিহির শাহ বলেন, জল হল জীবন ও জীবিকার প্রধান উৎস। সেই কারণে জলের বিভিন্ন ব্যবহার সার্বিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে করতে হবে। একাজে জন-সমূহ এবং সরকারের অংশগ্রহণ খুবই প্রয়োজন।

রিপোর্টটিতে খুব সঙ্গতভাবেই কৃষি-জীবিকা প্রসঙ্গে একটি বড় অংশ লেখা হয়েছে যা সংক্ষেপ করলে দাঁড়ায়।

- কৃষি থেকে আয় আর পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট নয় -বিশেষত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের ক্ষেত্রে। এই চাষিরা মোট জমির ৮৫ শতাংশের মালিক। এর মধ্যে আবার শুখা এলাকার চাষিরা অর্ধেকের বেশি জমির মালিক।
- এদের জন্য নতুন চাষের মডেল দরকার। এছাড়া শুখা এলাকা বিভিন্ন ধরনের ছোট দানা শস্য (মিলেট) চাষ ফের শুরু করা দরকার। কারণ এই ধরনের শস্য স্থানীয় এলাকার উপযুক্ত, শক্ত-সমর্থ, পুষ্টিকর। এইসব শস্য গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহ করাও দরকার।
- বিভিন্ন ধরনের সামূহিক বা যৌথ চাষ ব্যবস্থা চালু করা যাতে, ঋণ, ভরতুকি, জমির মালিকানা, সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছোট ও প্রান্তিক চাষিকে নানাদিক থেকে সহায়তা হতে পারে।
- অন্ধ্রপ্রদেশের ২০ লক্ষ চাষি সাফল্যের সাথে সামূহিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুস্থায়ী কৃষিকাজ করছে। এতে তাদের খরচ বহুল পরিমাণে কমেছে। কারণ ফসল তৈরি ও তা বাঁচানোর জন্য তাদের রাসায়নিক সার, বিষ ব্যবহার করতে হচ্ছে না। এ ধরনের চাষের প্রসার আরো ব্যাপকভাবে করতে হবে।
- চাষের জন্য মোট মিষ্টি জলের ৮০ শতাংশ ব্যবহার হয়। জল কে আরো বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করতে হবে। জল ও তার উৎসকে (ভূ-জল ও ভূপৃষ্ঠ জল উভয়কেই) সামাজিক সম্পদ বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। এসবই খুব ভালো ভালো কথা। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি। কেন্দ্রীয় সরকার হৈ হৈ করে পূর্ব ভারতে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব সংগঠিত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। এই সবুজ বিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার হল হাইব্রিড বীজ। যার জন্য প্রয়োজন প্রচুর জল, রাসায়নিক সার, বিষ। এতে পরিবেশ, স্বাস্থ্য দূষিত হবে একথা এখন সবাই জানে। কিন্তু অন্য যে বিপদ এরসাথে আসছে তা হল প্রচুর খরচ। এই খরচ সামলানোর জন্য ঋণ। ঋণের জন্য ভারতে কৃষকের আত্মহত্যা। এরসাথে যুক্ত হচ্ছে জমি থেকে উৎখাত হওয়ার ঘটনা। ছোট চাষি ঋণের দায়ে ক্রমশ প্রান্তিক চাষিতে পরিণত হচ্ছে। প্রান্তিক চাষি হচ্ছে ভূমিহীন।

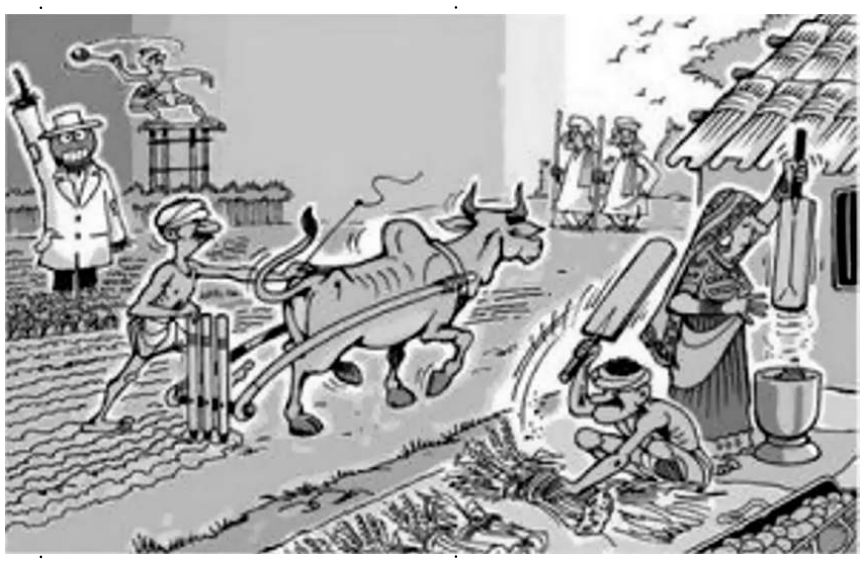

নিন্দুকেরা বলছে সবুজ বিপ্লব শুধু হাইব্রিড বীজে থেমে থাকবে না। জিন পরিবর্তিত ফসলও এরসঙ্গে ফেউ হিসেবে আসছে। কেউ কেউ বলছেন এ হল কৃষি সংস্কৃতি থেকে কৃষি-শিল্পে 'উত্তরণে'র এক ভয়ঙ্কর নীল-নকশা। না হলে সরকার সবুজ বিপ্লবের ভয়াবহ অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে কী করে বছরের পর বছর একাজে অর্থ বরাদ্দ করছে। গ্রামোন্নয়ন রিপোর্টে একদিকে যেমন মানুষের অংশগ্রহণ, প্রাকৃতিক সম্পদ কে সামূহিক সম্পদ বলা হচ্ছে। অন্যদিকে সেই কেন্দ্রীয় সরকারই আবার কৃষি রাজ্য তালিকায় থাকলেও বীজ, জিন ফসল, জৈবপ্রযুক্তি, জল ও জমির আইনের মাধ্যমে তা কুক্ষিগত করতে চাইছে বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। সরকারে মুখ আর মুখোশ নিয়ে তাই ধন্দ থেকেই যাচ্ছে।

চলতি চাষের ক্ষতিকর দিক নিয়ে বহু সমীক্ষায় প্রমাণিত কৃষির

শিল্পায়ন আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিকর। তবে এযাবৎ পৃথিবী জোড়া যে দুটি সমীক্ষা হয়েছে তার একটি বলেছে, 'বিভিন্ন বিকাশশীল দেশে, স্থানীয় জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে যে সুস্থায়ী কৃষি চলে তা খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সবথেকে কার্যকরী ও দীর্ঘস্থায়ী'। ২০০৬ সালে সংগঠিত এই সমীক্ষা করেছিল ইউনিভার্সিটি অব এসেক্স-এর গবেষকরা। তাঁরা সারা পৃথিবীর ৫৭টি দেশের মোট ২৮৬টি প্রজেক্টের বিভিন্ন তথ্য নিয়ে কাজ করেছিল। এর মধ্যে যে ১ কোটি ২৬ লক্ষ চাষি, যারা চলতি কৃষির থেকে সুস্থায়ী কৃষির দিকে গেছে তাদের, গড় উৎপাদন বেড়েছে ৭৯ শতাংশ। আর তাদের প্রত্যেকের জমিতে নানারকম ফসলের চাষ হচ্ছে। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, সুস্থায়ী কৃষি হল, স্থানীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরি সম্পদ সংরক্ষণকারী প্রযুক্তি। এটি প্রকৃতিকে অক্ষত রেখে তার সম্পদ ও পরিষেবাগুলি ব্যবহারে প্রযুক্তি। সমীক্ষায় আরো বলা হয়েছে, সুস্থায়ী কৃষি গ্রহণের জন্য ছোটো চাষিদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, ভবিষ্যতে অধিক উৎপাদন, লাভ ও স্থানীয় খাদ্য গ্রহণের ভাবনার প্রসারের পক্ষে সহযোগী হবে।

এরপরে কৃষি নিয়ে আজ অবধি সবথেকে বড় সমীক্ষাটি হয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অব অ্যাগ্রিকালচারাল নলেজ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট (আইএএসটিইডি) নামে। এই সমীক্ষায় যুক্ত ছিল, রাষ্ট্রসংঘ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কসহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা। মোট ৪০০ জন বিজ্ঞানী এবং ৮০টি দেশের উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা প্রায় ৪ বছর ধরে এই সমীক্ষায় যুক্ত ছিলেন। এই রিপোর্টের উপসংহারে মোটা হরফে তারা লিখেছিলেন, 'বর্তমানের জল, শক্তি এবং জলবায়ুর সমস্যার যুগে প্রচুর সম্পদের চাহিদা সম্পন্ন শিল্পায়িত কৃষি বিপজ্জনক এবং ভঙ্গুর'। এই রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, 'কৃষির শিল্পায়ন এবং পুরোনো কিছু কৃষি পদ্ধতি বিভিন্ন কৃষি-পরিবেশ ব্যবস্থাকে ধারাবাহিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ফলে সুস্থায়ী ব্যবস্থায় ফিরতে কিছু সময় লাগবে।' কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

আর্থিক দিক থেকে ক্ষতি হয়েছে চলতি চাষ পদ্ধতির ফলে। কিন্তু এই চাষ পদ্ধতি আরো বেশি সমালোচিত হয়েছে তার সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষতিকর দিক নিয়ে। অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে চাষের অন্যতম প্রধান উপকরণ জল ও তার উৎস দূষিত হয়েছে। চাষি, ক্ষেতমজুর এবং উপভোক্তা বিষে আক্রান্ত হয়েছে। উপকারী প্রাণী উদ্ভিদ মারা পড়েছে। অতিরিক্ত পরিমাণে ভূজল ব্যবহার করে সেচের ফলে উর্বর জমি লবণাক্ত হয়েছে, উৎপাদন কমে গেছে। জলে আর্সেনিক, ফ্লুরাইড-এর দূষণ বেড়েছে। ভূজলের তল অনেক নিচে নেমেছে, এতে পানীয় জলের অভাব দেখা দিচ্ছে। বৃষ্টির জলেও এই অভাব পূরণ হচ্ছে না। সামান্য কয়েকটি তণ্ডুল জাতীয় ফসলের ওপর নির্ভরতায় চাষের জমির জৈব বৈচিত্র প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এই ধরনের একক ফসলের চাষে জমি ব্যবহারের নকশা বদলে গেছে। জমির সার্বিক উৎপাদন কমেছে। অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে জমিতে অণুজীবের পরিমাণ কমে গেছে। ফলে কমে গেছে কার্বনের পরিমাণ। এতে মাটি শক্ত হয়ে গেছে। রাসায়নিক বিষ ব্যবহারের ফলে উপকারী ও অপকারী উভয় কীট-পতঙ্গ, প্রাণীই মরেছে। জৈবিকভাবে কীট নিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতি ছিল তা নষ্ট হয়েছে। ফলে ক্ষতিকর পোকা মাকড়ের আক্রমণ বেশি হয়েছে। পরে অভিযোজিত এইসব কীটপতঙ্গ দমন করতে আরো শক্তিশালী বিষ ব্যবহার করতে হয়েছে। এভাবে জৈববৈচিত্রও নষ্ট হয়েছে।

আমাদের দেশের চাষ মূলত ছোট, প্রান্তিক চাষি অধ্যুষিত। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী প্রান্তিক, ছোট ও স্বল্প মাঝারি চাষির পরিমাণ যথাক্রমে ৬৩, ১৮.৯ এবং ১১.৭ শতাংশ। অর্থাৎ মোট ৯৩.৬ শতাংশ চাষি এই অংশের। এদের

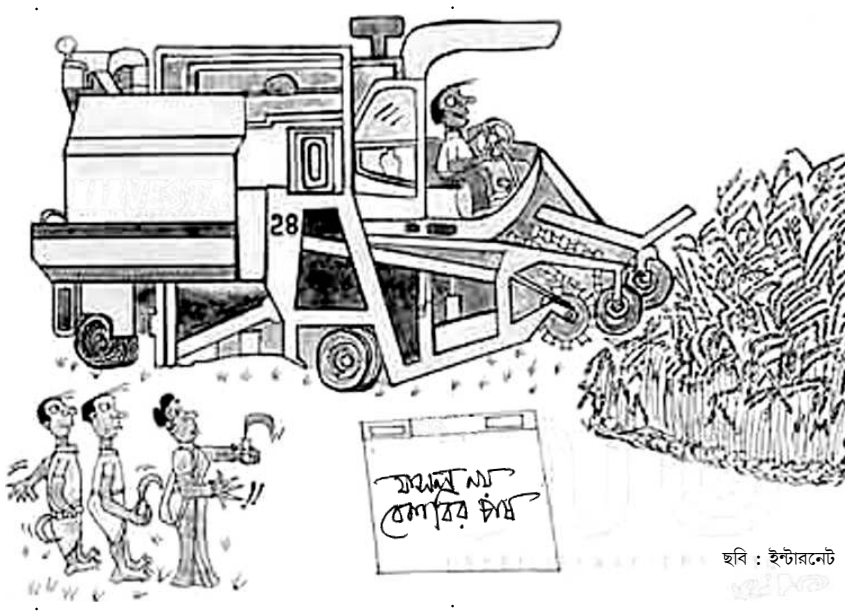

ছবি : ইন্টারনেট

গড় জমির পরিমাণ ০.৪০, ১.৪১ এবং ২.৭২ হেক্টর। তবে মোট চাষের ৬২.৯৬ শতাংশ এদের দখলে। এর সাথে রয়েছে বর্গাদার ও ক্ষেত মজুর। যাদের জীবন-জীবিকা নির্ভর হয়ে আছে চাষের ওপর। ন্যাশনাল কমিশন ফর এন্টারপ্রাইজ ইন আন-অরগানাইজড সেক্টর ২০০৯ সালে দ্য চ্যালেঞ্জ অব এমপ্লয়মেন্ট ইন ইন্ডিয়া : অ্যান ইনফরমাল ইকনোমি পার্সপেক্টিভ নামে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, এইসব চাষিদের জমি থেকে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বড় চাষের জমি থেকে বেশি। উপযুক্ত সংস্থাগত ঋণ পাওয়ার ফলে এইসব চাষিরা, উচ্চফলনশীল বীজ ও অন্যান উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকারী বড় জোতের থেকেও বেশি উৎপাদন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি

উত্তরের পাহাড়ী অঞ্চল বাদ দিলে এ রাজ্যের জলবায়ু সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান ও আর্দ্র। গড় বৃষ্টির পরিমাণ ১৭৫০ মিলিমিটার হলেও জেলা অনুযায়ী বৃষ্টিপাতের পরিমাণের অনেক হেরফের হয়। গরমের সময় এরাজ্যের তাপমাত্রা থাকে ২৪-৪০ ডিগ্রি এবং শীতে ৭-২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জনসংখ্যার বেশিরভাগের প্রধান জীবিকার উৎস হল কৃষি। কৃষি হল আবার ছোট চাষি কেন্দ্রীক। কারণ ৯০ শতাংশ চাষি ছোট বা প্রান্তিক চাষি। রাজ্যের মোট কৃষি জমি ৮৪ শতাংশ ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের দখলে। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৭০ ভাগ মানুষ তাদের জীবিকার জন্য চাষের ওপর নির্ভরশীল। দেশের মোট কৃষি জমির মাত্র ২.৭ শতাংশ এরাজ্যে হাতে থাকলেও দেশের মোট খাদ্যশস্যের ৭.৮ শতাংশ উৎপাদন করে এরাজ্য।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসলগুলি হল, ধান, গম, চা, আলু, আখ, ডাল ও তেলবীজ। গত দুই দশকে রাজ্যের শস্য নিবিড়তা (ক্রপিং ইন্টেনসিটি) ১৩১ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮৪ শতাংশে। দেশের মধ্যে এরাজ্য ধান উৎপাদনে প্রথম। পাট ও তেলবীজ উৎপাদনও যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। দেশের মোট আলু উৎপাদনের ২৮ শতাংশ উৎপাদিত হয় পশ্চিমবঙ্গে। ভালো গুণমানের চা, তামাক এবং আখ উৎপাদন হয় এরাজ্যে। তবে এখানে খাদ্য ফসল উৎপাদিত হয় বেশিরভাগ জমিতে। এর মধ্যে ৭৮ ভাগ জমিতে প্রধান খাদ্য ফসলগুলির চাষ হয়।

রাজ্যে সেচ ব্যবস্থার আওতায় থাকা জমির পরিমাণ ৬৭.৪৩ লক্ষ হেক্টর। তবে প্রকৃতপক্ষে এর ৮০ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যায়। অন্যদিকে সেচ প্রকল্পের জন্য তৈরি বড় বাঁধ এখন বন্যার অন্যতম কারণ।

রাজ্যের ঘরোয়া উৎপাদন (স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা এসডিপি)-এর ৪.৪১ শতাংশ প্রাণীপালন

থেকে হয়। গত তিন দশকে প্রাণীপালনের যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও ক্রমবর্ধমান মোট চাহিদার অনেকটাই জোগান দিতে পারছে না।

মিষ্টি জলের মাছ উৎপাদনের অন্যতম প্রধান এবং ও ডিমপোনার প্রধান উৎপাদক পশ্চিমবঙ্গ। অন্তর্দেশীয় উৎপাদনের ৩০ শতাংশ মাছ উৎপাদিত হয় এরাজ্যে। ১৯৮৭-৮৮ সালে বিদেশে মাছ রফতানি থেকে এ রাজ্যের আয় হত ৫০ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯-এ এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২৫ কোটি টাকা।

অপারেশন বর্গার মাধ্যমে চাষ করার অধিকার পাওয়ার ফলে প্রায় ৩০ লক্ষ ভূমিহীন পরিবারও চাষের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। রাজ্যের মোট এলাকা হল ৮৮৭৫২ বর্গ কিলোমিটার যা ভারতের মোট ভৌগোলিক এলাকার মাত্র ২.৭ শতাংশ। কিন্তু জনসংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ। আর সেই কারণেরই প্রতি বর্গকিলোমিটারে এ রাজ্যের জন-ঘনত্ব (১০২৮) ভারতের জন-ঘনত্বের (৩৮২) থেকে অনেক বেশি। ফলত জমি ক্রমশ ছোট হতে হতে তা আর্থিক দিক থেকে অলাভজনক হয়ে পড়ছে। চাষের ইন্ধনগুলির প্রচুর দাম বৃদ্ধি, কৃষি পণ্য বিশেষ করে দ্রুত পচনশীল পণ্যের অনিশ্চিত দাম, দুর্বল বাজার পরিকাঠামো ও ব্যবস্থা, অপ্রতুল প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের কৃষিপণ্যের অভাবী বিক্রিতে বাধ্য হওয়া, রাজ্যের কৃষির অন্যতম কয়েকটি সমস্যা।

এরাজ্যে পরিবারভিত্তিক মিশ্রচাষের একটা অত্যন্ত সুগঠিত ব্যবস্থা বহুযুগ ধরে তৈরি হয়েছিল। যেখানে নানারকম ফসলের সঙ্গে পশুপাখি, মাছ ইত্যাদি যুক্তভাবে চাষ হত। যেখান থেকে পরিবারের খাদ্যের চাহিদা পূরণ হয়ে অতিরিক্ত ফসল থেকে বেশ কিছুটা আয় হত। কিন্তু এই পরিবারভিত্তিক চাষ ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্তমান সবুজ বিপ্লব কৃষির প্রার্দুভাবে এ ঘটনা ঘটছে। প্রধানত পশুপাখি, মাছ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এই ব্যবস্থা থেকে।

রাজ্যের কৃষির জমির উর্বরা শক্তি কমছে। ভূমিক্ষয়, বন্যা, নদী ও জলাধারগুলিতে পলি জমে বুজে যাওয়ার কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় এরাজ্যের কৃষিকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করছে প্রতিনিয়ত। রাজ্যে বর্তমানে অবক্ষয় হওয়া জমির পরিমাণ প্রায় ২১.৯১ লক্ষ হেক্টর। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে ৪৪.৯৩ জমির জলনিকাশীর সমস্যা। সব মিলিয়ে কৃষিতে নির্ভরশীল পরিবারগুলি আর্থ-সামাজিক অবস্থা ক্রমশ সংঙ্কটজনক হয়ে চলেছে। এলাকা এবং কৃষি-আবহাওয়া অঞ্চল ভিত্তিক উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রয়োগ, লাগসই আর্থিক, বাজার ও বীমা ব্যবস্থা তৈরি এবং সামাজিক অংশগ্রহণ ছাড়া এরাজ্যের কৃষির সুস্থায়িত্ব সম্ভব নয়।

আমরা আগেই বলেছি, কৃষি এরাজ্যের বেশিরভাগ মানুষের জীবিকার সংস্থান করছে। আর তাই এরাজ্যের কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ার অভিমুখ, কৃষিজীবি মানুষের স্বচ্ছল জীবন-জীবিকার লক্ষ্যে রচিত হওয়া উচিত।

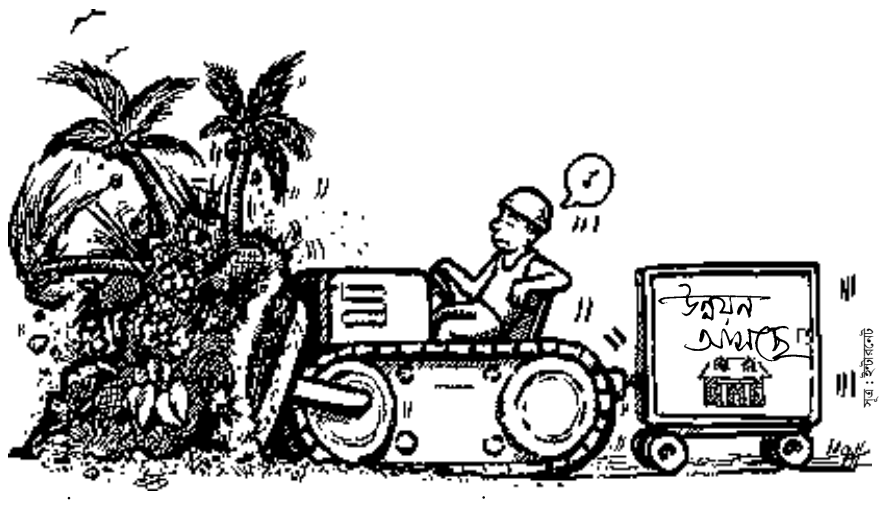

সূত্র : ইন্টারনেট

রাজ্যের কৃষির সমস্যার সংক্ষিপ্তসার

- ছোটো এবং টুকরো টুকরো জমির মালিকানা। চাষি পিছু গড় মালিকানা ০.৮২ হেক্টর।
- একক ফসল বিশেষত ১-২টি ফসলের চাষ।
- চাষির আর্থিক দুর্বলতা।
- চাষের কাজে বাইরের ইন্ধন (ইনপুট) যেমন সার, বিষ, বীজ ইত্যাদির প্রতি নির্ভরশীলতা ও আগ্রহ।
- অত্যধিক রাসায়নিক সার এবং বিষের ব্যবহারের ফলে দ্রুত মাটির স্বাস্থ্য এবং উৎপাদনশীলতার অবক্ষয়।
- প্রকৃতিমুখী কৃষির পরিবর্তে প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়কারী কৃষি ব্যবস্থা।
- ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের ঋণ, বীমা, অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির চরম অনীহা। যেটুকু ব্যবস্থা হচ্ছে তা সময় মতো সরবরাহ হচ্ছে না।
- পরিকাঠামোহীন এবং অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থা এবং ফড়েদের একাধিপত্য।
- উৎপাদন পরবর্তী ফসল ব্যবস্থাপনা বিশেষত মূল্যযোগ বিষয়ক সুযোগ সুবিধার অভাব।
- অত্যন্ত খারাপ নিকাশী ব্যবস্থা। দীর্ঘস্থায়ী জল জমে থাকা। অপ্রতুল সেচ।
- সরকারি কৃষি প্রসার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি।
- ভালো গুণমাণ সম্পন্ন বীজের অভাব।
- সামগ্রিকভাবে কৃষির প্রতি অবহেলা, পেশা হিসেবে অশ্রদ্ধা, অসম্মান এবং গুরুত্বহীনতা। অর্থকরী না হওয়ায় কৃষি পরিবারগুলির নতুন প্রজন্মের মধ্যে কৃষিকাজে অনীহা।
- কৃষি শিক্ষায় চাষি পরিবারকে অগ্রাধিকার না দেওয়া।
- ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের উপযোগী প্রযুক্তির বদলে 'আধুনিক' 'বৈজ্ঞানিক' ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত অনুপযুক্ত প্রযুক্তি চাপিয়ে দেওয়া।
- কৃষি জমির রূপান্তর ঘটিয়ে অন্য কাজে ব্যবহার।
- আয় না বাড়ার কারণে কৃষি শ্রমিকদের অন্যকাজে চলে যাওয়া
- জলবায়ু বদলের ফলে আবহাওয়া বিশেষ করে বর্ষার অনিশ্চিত বা খেয়ালী ব্যবহার।
- চাষযোগ্য ভূপৃষ্ঠ ও ভূজলের মান ও পরিমাণের অবনতি। দেশের বেশিরভাগ মানুষকে তাদের বুনিয়াদী চাহিদার থেকে বঞ্চিত করে রাখলে সে দেশের কখনোই প্রগতি হয় না। আর তাই দেশের বেশিরভাগ বিশেষত গ্রামীণ মানুষজনের প্রধান জীবিকাকে টিকিয়ে রাখতে সুস্থায়ী এবং পরিবেশমুখী কৃষি নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে খাদ্য পুষ্টির নিরাপত্তা যে বেশিরভাগ মানুষের নেই তা কার্যত কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করে নিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে। প্রকৃতি পরিবেশের অপরিহার্য নিয়মনীতিগুলিকে আর্থিক লাভের জন্য জলাঞ্জলী দিয়ে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কৃষিনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলেছে বহুবছর ধরে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তৈরি হওয়া পারম্পরিক কৃষি ব্যবস্থাকে। বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও নীতিকারদের যোগসাজসে যে ভুল কৃষিনীতি নিয়ে দেশ চলছে তা প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, ভূমি, মাটি, জল, বাতাস, জীববৈচিত্রের ব্যাপক অবক্ষয় করেছে। দেরী অনেক হয়েছে। কিন্তু এখনো সময় রয়েছে চাষি ও চাষ ব্যবস্থাকে যদি বাঁচতে হয় তবে এইসব অপরিণামদর্শী ও শুধুমাত্র নিজেদের আর্থিক লাভের জন্য তৈরি বৃহৎ পুঁজির হাত থেকে বেরোতে হবে। কৃষিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে চাষিদেরই। চাষের ইন্ধন, উৎপাদন, আর্থিক ও বাজার ব্যবস্থা, প্রক্রিয়াকরণ এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে চাষিদের মতই হবে চূড়ান্ত। বিজ্ঞানী,অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ইত্যাদিরা কৃষকদের অবস্থা এবং পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে বিভিন্ন উপায়ন্তর প্রস্তাব করে সহযোগিতা করবেন। এখানে রাষ্ট্রপ্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা এবং চাষিদের পক্ষে উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করবে।

প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় রোধের স্বার্থে এই কৃষি ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হবে আর্থিক দিক থেকে উপযুক্ত, সামাজিকভাবে ন্যায়সঙ্গত, প্রকৃতিমুখী ও পারম্পরিকভাবে সহভাগী ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ■■

সংকলন : সুব্রত কুণ্ডু

কৃষিনীতি ঘিরে আমাদের দাবি

১. কৃষকপরিবারগুলির অর্থনৈতিক তথা রোজগার নিশ্চয়তা

১.১ কৃষক পরিবারের জন্য বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। রীতিমতো আইন করে ফার্মার্জ ইনকাম কমিশন বানাতে হবে, যে কমিশন ফি বছর কৃষকের আয়ের দিকে নজর রাখবে ও কীভাবে এই আয়কে যথোপযুক্ত করা যায় তা নিয়ে সরকারকে প্রস্তাব দেবে। যার ভেতর ফসলের ন্যায্য দাম সহ কৃষকের সরাসরি মাসিক ভাতার মতো প্রস্তাবও থাকতে পারে।

১.২. কৃষির উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণের নতুন পদ্ধতি তৈরি করতে হবে। এই নতুন পদ্ধতি তৈরি হবে কৃষকের শ্রম, সম্পদ ও একজন মানুষকে ভালোভাবে বাঁচতে যা যা লাগে তার মূল্য হিসেব করে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঠিক করতে হবে কৃষকের পঞ্চাশ শতাংশ লাভ ও সংসারের ভরণ-পোষণের খরচের নিরিখে। এর কোনোরকম হেরফের ঘটলে তা সরকারি মাসিক ভাতা দিয়ে পূরণ করতে হবে।

১.৩. ফসলের ন্যায্য দামের নিরিখে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। কৃষকের বাড়তি ফসল সরাসরি কৃষকের থেকে সংগ্রহ ও স্থানীয় মজুত-বণ্টন ব্যবস্থার নিরিখে গণবণ্টন ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে।

১.৪. ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের যথাযথ ব্যবহারের জন্য সরকারকে মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড তৈরি করতে হবে। দাম ওঠাপড়ার ঝুঁকি থেকে কৃষককে রক্ষা করতে হবে।

১.৫. কৃষকের বাজারের সুযোগ বাড়াতে গ্রামেই মজুত ও প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা গঠনের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে।

১.৬. চাষে — বিশেষ করে প্রকৃতিমুখী চাষে সরকারি অনুদান দিতে হবে।

১.৭. সেচপ্রধান এলাকায় মরশুমে একর প্রতি ৪০ দিন আর বৃষ্টিপ্রধান এলাকায় মরশুমে একর প্রতি ৬০ দিন হিসেবে মজুরি-অনুদান দিতে হবে। এই উদ্যোগকে রাখতে হবে এমজিএনআরইজিএ-প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধার বাইরে।

১.৮. কৃষক-ভাগচাষি সহ কৃষিকাজে যুক্ত সকলের অবসর ভাতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা, দুর্ঘটনাবিমা বা জীবনবিমা ইত্যাদির জন্য সামাজিক নিরাপত্তা আইন চালু করতে হবে।

২. পরিবেশ বাঁচিয়ে কৃষি

২.১ পরিবেশমুখী চাষকে ফেরাতে বছর প্রতি ১০% জমি ধরে নির্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। পরিকল্পনার প্রয়োজনে সমস্ত অর্থ ও সহযোগিতা দিতে হবে।

২.২. সমস্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নিষিদ্ধ করতে হবে। নিষিদ্ধ করতে হবে সমস্ত ক্লাস ওয়ান ও ক্লাস টু গ্রুপের কীটনাশক। আর বাকি কীটনাশক সময়সীমা বেঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে কৃষি থেকে সরিয়ে নিতে হবে।

২.৩. জিনশস্যের চাষ নিয়ে স্থগিতাদেশ বহাল রাখতে হবে। জিনশস্যের পরীক্ষা তথা প্রক্রিয়াজাত খাবারের আমদানি নিয়ে জোরদার জীবপরিমণ্ডল-রক্ষা আইন চালু করতে হবে।

২.৪. বর্ষা-নির্ভর চাষ ও খরা-উপযোগী চাষে জোর দিতে হবে। বর্ষা-নির্ভর চাষে কারিগরি সাহায্য নিয়ে বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। ডাল-তেলবীজ-জোয়ার-বাজরা চাষের জন্য কৃষককে উৎসাহ দিতে হবে।

২.৫. কৃষি গবেষণার পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ প্রকৃতিমুখী ও সুস্থায়ী চাষে দিতে হবে, কৃষি গবেষণা কার্যক্রমকে (NARS)-বহুজাতিকের সার-তেল-কারিগরি থেকে ঘুরিয়ে সুস্থায়ী কৃষির দিকে আনতে হবে।

২.৬. জলবায়ু বদল রুখতে জিনশস্য প্রচলনের বদলে স্থানীয় জাত ও সুস্থায়ী চাষের ওপর জোর দিতে হবে।

৩. জনগোষ্ঠীর সম্পদ ও অধিকার রক্ষা

৩.১. বীজ উৎপাদন ও কৃষির দেশজ জ্ঞানের ওপর কোনোরকম মেধাস্বত্ব চলবে না। কেন্দ্র-রাজ্য সরকার ও সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মনস্যান্টো সহ সমস্ত বহুজাতিকের চুক্তি বাতিল করতে হবে।

৩.২. বীজ আইন চালু করে সরকারকে বীজের দাম ও বীজ উৎপাদনের স্বত্ব বাবদ অর্থ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাজ্য সরকারগুলোকে বীজ লাইসেন্স, খারাপ বীজের জন্য ক্ষতিপূরণ ও বীজের দাম ও স্বত্ব বাবদ দেয় অর্থ নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে।

৩.৪. অকৃষি ও খাদ্য উৎপাদন-বহির্ভূত কাজে চাষের জমির জবরদস্তি অধিগ্রহণ চলবে না। চলতি ভূমি অধিগ্রহণ আইন বাতিল করে নতুন প্রস্তাবের বিবেচনার ভিত্তিতে, একটি জনমুখী নতুন ভূমি অধিগ্রহণ আইন চালু করতে হবে।

৩.৫. বনাধিকারআইন যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে। আদিবাসী উচ্ছেদ চলবে না। শিল্প ও খনির জন্য জঙ্গল ধ্বংস বন্ধ করতে হবে।

৩.৬. জলের বেসরকারিকরণ চলবে না। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জল-ব্যবহার নিয়ে ভাবতে হবে। সেচ ও পানীয় জলে জোর দিতে হবে। ছোট জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার জনগোষ্ঠীকে দিতে হবে।

৪. সবার জন্য বৈচিত্রময়-খাঁটি-পুষ্টিকর ও উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য

৪.১. দেশবাসীকে বিষমুক্ত খাবার দিতে হবে। চাষে বিষ-রাসায়নিকের ব্যবহার সবার আগে বন্ধ করতে হবে।

৪.২. গণবণ্টন ব্যবস্থা সহ সমস্ত খাদ্য প্রকল্পকে নতুন করে সাজাতে হবে। জোর দিতে হবে স্থানীয় উৎপাদন, সংগ্রহ, মজুত ও বণ্টনে। এই বণ্টন-ব্যবস্থায় খাদ্য সামগ্রী হিসেবে জোয়ার, বাজরা, ডাল ও তেলবীজ অবশ্যই থাকতে হবে।

৪.৩. খাবারে রাসায়নিকের মাত্রা ও জিনশস্যজাত খাবার নিয়ে ক্রেতাকে খাবারের লেবেল ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির খোঁজখবর নেওয়ার অধিকার দিতে হবে।

সূত্র : ইন্টারনেট

একটি দেশের গল্প

তরুণ দেবনাথ

সম্প্রতি চমস্কি বলছেন মানবসভ্যতার উপর অনেকগুলি খাঁড়া ঝুলছে। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হল পরিবেশগত বিপর্যয়। ফলে মানুষের ভবিষ্যৎ খুবই করুণ। প্রকৃতি তার ধারণ ও পুনরুজ্জীবন ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। এর চিহ্নগুলি খুব স্পষ্ট। চোখ-কান খোলা রাখলেই এটা বোঝা যাচ্ছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান পত্রিকাগুলি এই সতর্কবার্তা দিনকে দিন স্পষ্টতর করছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ১৯৬১ সালে মানুষ সারা পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করত। বর্তমান সভ্যতাকে ধরে রাখার জন্য সখানে এখন সেখানে ১.৫ গুণের বেশি সম্পদ দরকার। শতকরা ৮০ ভাগ দেশের মানুষ নিজেদের ক্ষমতার সীমার বাইরে গিয়ে জীবনযাপন করছেন। এই দেশগুলি হয় নিজের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ শেষ করছে, কিংবা অন্যদেশকে নিঃশেষ করেছে। জাপানিরা ৭.১ ভাগ জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করছে। আর ইটালির দরকার ৪টে ইটালির।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিশ্বজুড়ে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে। কিছু মানুষ একান্তভাবে সম্ভাব্য ধ্বংসকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে বেশ কিছু উদ্যোগ চলছে এই বিপদকে উপেক্ষা করার।

আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন একটি স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন পেতে পারে-এই চেষ্টায় অগ্রগণ্য হচ্ছেন 'আদিম সমাজের মানুষেরা'। অন্যদিকে যারা এই আদিম মানুষগুলিকে নির্মূল করেছে বা প্রান্তিক বানিয়েছে, তারা উৎসাহ সহকারে সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদকে নষ্ট করে উন্নয়ন, আর্থিক বৃদ্ধি অর্থাৎ জিডিপি কে সামনে রেখে উন্নয়ন পৃথিবীকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এইটাই দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাম্প্রতিক ইতিহাসের শক্তিশালী ধারা। এটা এক ধরনের উন্মাদ মানসিকতা-যা কিনা সত্যিই সমস্ত ধরনের যুক্তির বিপরীতে অবস্থান করে। শুধু তাই নয় বিশাল কর্পোরেট প্রচার যন্ত্র এই উন্মাদ মানসিকতা সবার মনে গেঁথে দিচ্ছে এবং শক্তিশালী করছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি দেশের কথা শুনব, যার নেতা বলেছেন- 'ভোগবাদ নির্ভর সমাজ' আর 'উন্নয়ন ও মানব প্রজাতির জন্য দরকারি প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তি' কখনই একসাথে টিকে থাকতে পারে না। দেশটির নাম কিউবা। দেশটির মাথাপিছু আয় খুব কম, কিন্তু জীবনের গুণগত মান উন্নত। এটা একটা ধাঁধা। একটি দেশ বস্তু সম্পদের নিরিখে গরিব কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পরিষেবায় উন্নততম দেশগুলিকে টেক্কা দিচ্ছে। মানব উন্নয়নে অনেক এগিয়ে কিন্তু পরিবেশের উপর চাপ কম-ফলে খনিজ জ্বালানির ব্যবহার ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণও কম। বিনা পয়সায় শিক্ষা, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য-পরিষেবা, প্রাথমিক পুষ্টি আর বয়স্ক লোকেদের জন্য সাহায্য- দেশটি সংকটজনক অবস্থাতেও চালিয়ে গেছে। ডব্লুডব্লুএফ তাদের ২০০৩-এর লিভিং প্ল্যানেট রিপোর্টে সুস্থায়ী উন্নয়নের নিরিখে এই দেশটিকে বিশ্বের মধ্যে একমাত্র দেশ বলে চিহ্নিত করেছে। এই দেশের মানুষদের থাকার জায়গা ছোট (২৫০ বর্গফুট, আমেরিকায় ৮০০ বর্গফুট), ব্যক্তিগত ভোগ্য দ্রব্যের ব্যবহার কম, কিন্তু তারা জানে তাদের বাড়ির শিশু উপযুক্ত শিক্ষা পাবে,তাদের কাউকে ভুখা থাকতে হবে না কিংবা বাসস্থানহীন অবস্থায় হবেনা।

সূত্র : ইন্টারনেট

কিন্তু যানবাহনের বেলায় ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে গণ-পরিবহন ব্যবস্থা, সরকারি বেসরকারি গাড়িতে লিফট, ঘোড়া টানা গাড়ি ইত্যাদি। এর সাথে সুবিস্তৃত ট্যাক্সি পরিষেবা। এই দেশটি কৃষি ব্যবস্থায় প্রচুর বদল এনেছে। যন্ত্র ও রাসায়নিক-নির্ভর রফতানিমুখী চাষ বদলে ফেলা হয়েছে। রাসায়নিক সার, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও যন্ত্রের ব্যবহার কমানোর জন্য ব্যাপক ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছে। রাসায়নিক সারের ব্যবহার আগের তুলনায় কমেছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জৈবসার, পশু দিয়ে হাল, মিশ্রচাষ, জৈব কীটনাশক ইত্যাদি। এর জন্য উপযুক্ত মূল্য ও বন্টণ ব্যবস্থা। এমনকি শহরের ফাঁকা জমিতে

সূত্র : ইন্টারনেট

চাষ। সঙ্গে আছে চাষিদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে পরিবেশমুখী কৃষি ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮-র মধ্যে সবজি উৎপাদন দ্বিগুণ-এরকম অনেক সাফল্যের উদাহরণ আছে। ফাও-এর রিপোর্ট বলছে দেশের মানুষের জন্য মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরির হার, সমস্ত মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। মজার কথা হল, এ সমস্ত কিছুই হয়েছে আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাহায্য ছাড়াই এবং মাথাপিছু কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের মাত্রা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে।

শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হল- শিক্ষামন্ত্রককে সঙ্গে নিয়ে ছোটদের বিশেষ 'শক্তি-শিক্ষা'। শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ছোটদের শেখানো যাতে তা শুধু পরিবার নয়, সমগ্র সমাজের বিদ্যুৎ ব্যবহারের রীতিনীতিকে পাল্টে দিতে পারে। শক্তি ব্যবহারে দেশের মূল লক্ষ্য ছিল আর্থিক ক্ষেত্রে সুস্থায়ী উন্নয়ন ও শক্তির

অনিশ্চয়তা কমিয়ে আনা। এর জন্য তারা অনেক ধরনের ব্যবস্থা নেয়, সাধারণ বাতির বদলে সিএফএল, পুরোনো জীর্ণ-শীর্ণ-পাখা, ফ্রিজ, বাতানুকুল যন্ত্র, টিভি, মোটর পাল্টে ফেলা। কুকারের ব্যবহার বাড়ানো। পুর্ণব্যবহারযোগ্য শক্তি যেমন উইন্ডমিল, জলবিদ্যুৎ সৌরশক্তি, জৈবগ্যাস, জৈব জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো। এর জন্য সরকার থেকে কম দামে ওই ধরনের উন্নত যন্ত্র দেওয়া হয়। সমস্ত কিছু মিলিয়ে দেশের মানুষ সারা বিশ্বের চেয়ে গড়ে শতকরা ৪৩ ভাগ কম শক্তি ব্যবহার করে, যার ফলে শতকরা ৪৪ ভাগ কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছাড়ে। আমেরিকার তুলনায় এই দেশের মানুষ শতকরা ৮৫ ভাগ কম শক্তি খরচ করে। এই দেশের শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক কম জিনিসপত্র, কিন্তু দেশের মানুষের মানবিক ও সামাজিক সম্পদ অনেক বেশি। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিচর্যা দেশের সংবিধান দ্বারাই সুরক্ষিত। কিউবায় প্রতি হাজার মানুষের জন্য ৬.৪ জন ডাক্তার (আমেরিকায় ২.৬৭) সামগ্রিক পরিকল্পনার প্রতিষেধক ও প্রতিরোধ ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয়। শিশু মৃত্যুর হার হাজার জন্ম প্রতি মাত্র ৪.৮ (আমেরিকায় ৬.০৬ বছর) সেভ দি চিলড্রেন মায়েদের জন্য ও মেয়েদের জন্য দুটি সূচক তৈরি করেছে। তাদের ২০১২ সালের হিসেব বলছে এই দেশটির স্থান উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় এই দেশের মানুষের গড়ে ১৮ বছর প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত থাকে। আমেরিকার জন্য এই সংখ্যাটি ১৫ বছর আর বিশ্বের সব দেশ মিলিয়ে ১১ বছর। সুশিক্ষিত জনগণই দেশকে সজীব রাখতে আর দেশের বিভিন্ন

সূত্র : ইন্টারনেট

অসুবিধাগুলি দূর করতে সাহায্য করে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিপোর্ট বলছে-স্কুলে শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তি ও উপস্থিতি, প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ বয়স্ক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা সহ সমস্ত স্তরের শিক্ষায় মেয়েদের সমান উপস্থিতি, শক্তিশালী বিজ্ঞানমুখী শিক্ষণ-ব্যবস্থা বিশেষ করে রসায়ন ও চিকিৎসাক্ষেত্রে গ্রাম-শহর মিলিয়ে সুসংহত শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি সব মিলিয়ে এই দেশের শিক্ষায়তন উন্নত দেশগুলির সমান, কিন্তু আর্থিক অবস্থা একটি উন্নয়নশীল দেশের মতো।

এই দেশ দেখাচ্ছে সারা বিশ্বের দরকার শক্তির জন্য বিপ্লব। কিন্তু এই কাজটি করতে গেলে প্রথমেই দরকার চেতনার বিপ্লব। যে চেতনার উন্মোষিত হবে কার্বন-নির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের চলতি মডেল থেকে বেরিয়ে আসার স্বীকৃতি। এই চেনার বিরোধীতা ধনী দেশগুলি করছে। কিন্তু ইতিহাসের লেখা পরিষ্কার মানুষ বাঁচবে, উন্নততর হবে, যদি মানবসভ্যতার সংকটের সন্ধিক্ষণে এই দেশ থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়।

এখন একটি কথা বলা দরকার কিউবাও জ্বালানি নির্ভর একটি মডেল অনুসরণ করত। ১৯৯০-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তাদের তেল আমদানি ও অন্যান্য বাণিজ্য চূড়ান্তভাবে ধ্বসে পড়ে। আমেরিকা সুযোগ বুঝে আগেকার বাধানিষেধের সঙ্গে নির্মমভাবে আরও অনেক বাড়া ও এমনকি ক্ষতির চেষ্টা করে। এইরকম চূড়ান্ত জাতীয় সংকটের থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কিউবা বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু এর সঙ্গে এটা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত যে কিউবার মানবিক ও সামাজিক অর্থাৎ সচেতনতা, সামাজিক বোধ, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদির ভিত্তি আগের থেকেই দৃঢ় ছিল। কিউবায় গণ সংগঠনগুলির সঙ্গে বেসরকারি সংগঠনগুলিও এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের সঙ্গে সরকারি উদ্যোগগুলির যোগাযোগ জরুরি। তার জন্য রেডিও ও টিভি সংকটের অবস্থা ও সরকারি উদ্যোগগুলি নিয়ে জনগণের সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করে।

সূত্র : ইন্টারনেট

যার ফলে ১৯৯-র গভীর সংকটের সময় নতুন সিদ্ধান্তগুলি রূপায়ণ করতে সারা দেশই এগিয়ে আসে।

এবার একটু নিজের দেশের দিকে তাকানো যাক। সংবাদে প্রকাশ, ভারতের আমদানির শতকরা ৩৪ ভাগ খরচ হয় তেল কেনার জন্য। এরপর আছে- অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য স্থায়ী যন্ত্রপাতি, সোনা, রূপা ও বিভিন্ন রত্ন সামগ্রী, কয়লা ও কয়লাজাত দ্রব্য, ভোগ্যপণ্য, রাসায়নিক সার ইত্যাদি। আমদানির বেশিরভাগই শক্তি ও বিলাসবাসনের খরচ মেটাতে যায়। এদিকে ভারতে চলতি খাতায় ঘাটতি বাড়ছে অর্থাৎ আমদানি খরচের তুলনায় রফতানি আয় ও তার সঙ্গে অনাবাসী ভারতীয়দের পাঠানো বিদেশী মুদ্রা ও বিদেশীর বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে। ভারতের টাকার মূল্য ভীষণভাবে কমছে। জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতের আমদানি খাতে খরচ বাড়ছে, কিন্তু রফতানি বাড়ছে না। একই সঙ্গে বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই, এফআইআই) ভারতে আসার বদলে দ্রুত বাইরে চলে যাচ্ছে। নীটফল চলতি খাতে ঘাটতি বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে। ভারত দেশটাই টলে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালের মূলধারা অর্থনীতিবিদরা তাই বলছেন- রফতানি বাড়াও দেশকে এমনভাবে বাণিজ্যের জন্য তৈরি কর যাতে বিদেশীরা এই দেশমুখী হয়ে যায়। অর্থাৎ এতদিন যা করে বিপদ ডেকে আনা হল, সেই বিপদ

কাটানোর জন্য পুরোনো ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে যাও। এই জন্যই আইনস্টাইন বলেছিলেন 'যদি আমরা যেটা করছি, সেটা করতে থাকি, তবে আমরা যা পেয়ে আসছি, তাই পাব। পাগলামোর একটা সংজ্ঞা হচ্ছে- একই কাজ করে যাওয়া আর অন্য ফল আশা করা'।

সত্যি কথা বলতে বামপন্থী-ডানপন্থী সবাই যখন চিন-আমেরিকার জিডিপি নির্ভর উন্নয়নকেই একমাত্র মডেল হিসাবে ভাবছেন-তখন কিউবা নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। কৃষি-শিল্পকে সুসংহত করে, স্বাস্থ্য-শিক্ষা সুনিশ্চিত করে, মানুষের জন্য মানুষের সম্প্রীতি বাড়িয়ে, জীবন-জীবিকার সুনিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে পতঙ্গের মত আগুনের দিকে এগিয়ে যাব কিনা-এটা ভাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। এই লেখাটি অর্থনীতির উপর কোনো বিশ্লেষণ নয়, কিন্তু অবশ্যই অর্থনীতিকে সমাজ, সংস্কৃতি ও পরিবেশকে জড়িয়ে নিয়ে আলাদাভাবে দেখার চেষ্টা মাত্র।

পুনশ্চ : কয়েকদিন আগে দিল্লিতে ভারত সরকারের একজন সচিব পর্যায়ের আধিকারিক বলছিলেন ''কিউবায় সুস্থায়ী চাষের উপর খুব ভালো কাজ হয়েছে। আমরা এই ধরনের প্রযুক্তি প্রয়োগ করছি।'' আমি বললাম-এই ধরনের উদ্যোগ থেকে ফল পেতে গেলে সামাজিক উদ্যোগের (Social Mobilisation) সঙ্গে উপযুক্ত রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিকাঠামো দরকার। আমাদের দেশেতো এই গুলির অভাব। তাহলে... ■■

ন তু ন ব ই

খাওয়ার আইন। সবাই খাওয়ার আইন-খাদ্য সুরক্ষা আইন। তবে আইন করে সবাই খাবার পাবে কি পাবে না তা নিয়ে দোলাচল বার্তাজীবী -সমাজব্রতী - অর্থশাস্ত্রী সমাজে। এই বইতে এমনই যুক্তিবাণে ১০ চিন্তক ১০ নিবন্ধে, একেবারে জঁ দ্রেজ থেকে দেবিন্দর শর্মা। তৎসহ আইনের কথাসার।

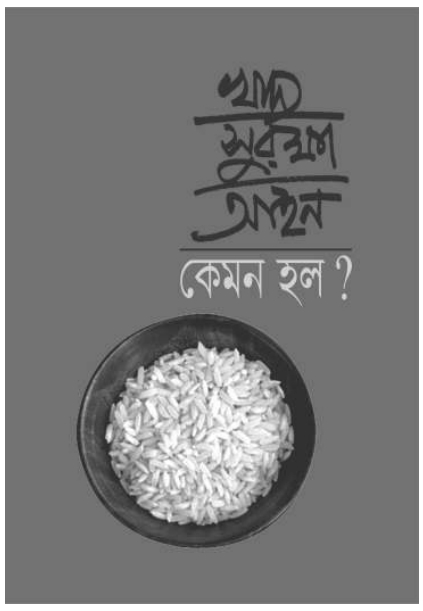

ডি আর সি এস সি
২৪৭৩৪৩৬৪ || ২৪৪২৭৩১১ || ৯৪৩৩৫১১১৩৪ || drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com

সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু
সম্পাদনা সহযোগী : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
হরফ : শিপ্রা দাস রূপ : অভিজিত দাস
মুদ্রাকর : লক্ষ্মীকান্ত নস্কর

Book Post
Printed Matter

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সোমজিতা চক্রবর্তী কর্তৃক ১৮বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
যোগাযোগ : প্রজেক্ট অফিস, ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৪২, দূরভাষ : ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৪৪২ ৭৫৬৩
ই-মেল : drcsc.ind@gmail.com, www.drcsc.org